দেশ – বই সংখ্যা, ২ ফেব্রুয়ারী, ২০০৭

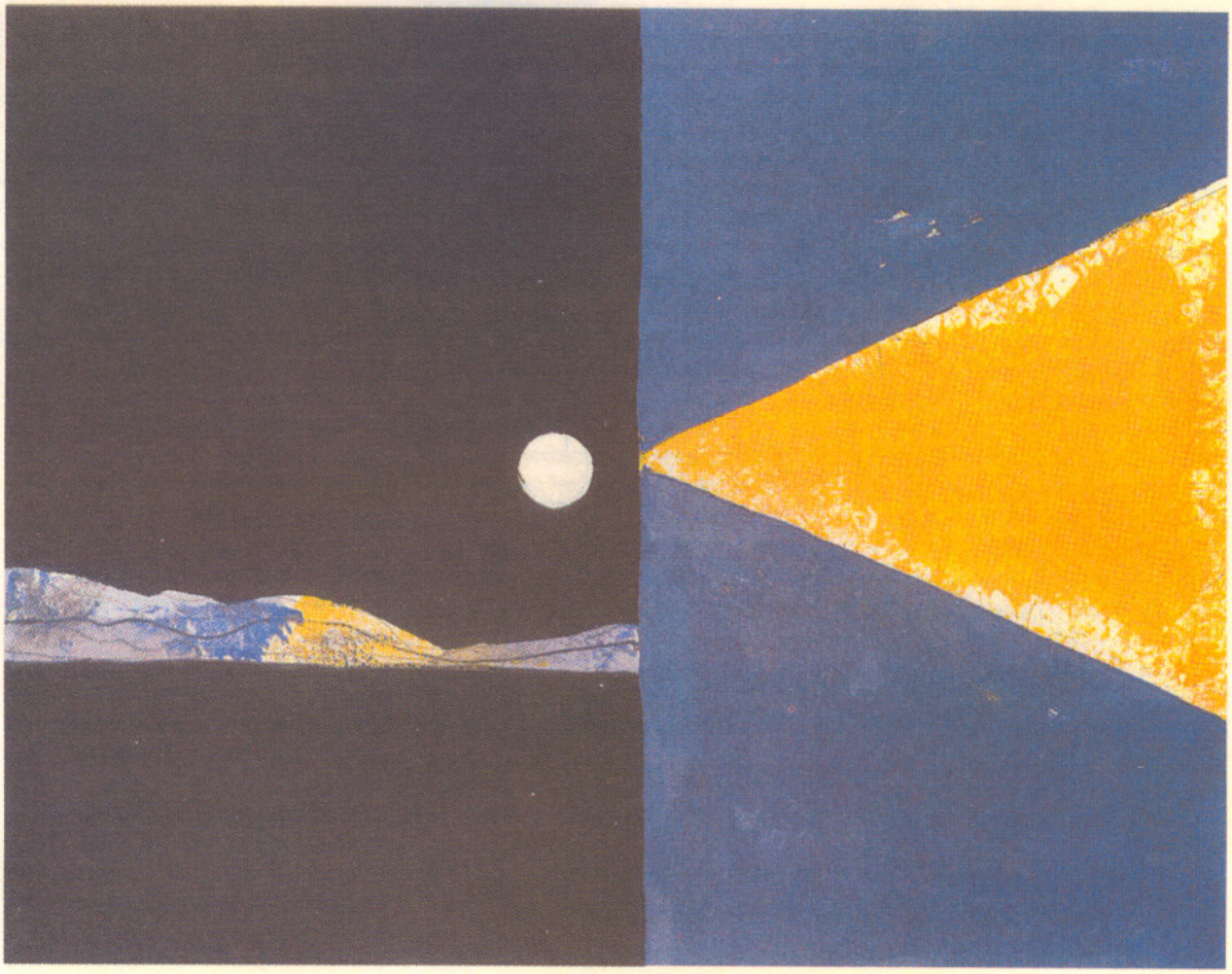

দীপঙ্কর হোম

নীল নদের দেশের বিজ্ঞানী

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে ১৯৯৯ সালের নোবেল পুরস্কার ঘোষণা একটি বিশেষ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত—ওই বছরই প্রথম একজন মধ্যপ্রাচ্যের বিজ্ঞানী নোবেল জয় করেন। তিনি মিশরের আহমেদ জুয়েল—যাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতি অণু-পরমাণুদের পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গোড়াপত্তনে মিশরীয় সভ্যতা এবং আরব মনীষীদের নানাবিধ মৌলিক অবদানের যে-লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়, একথা স্মরণ করে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ভাষণে অধ্যাপক জুয়েল কল্পনা করার চেষ্টা করেন যে, আজ থেকে প্রায় ছ'হাজার বছর আগে যখন মিশরীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটছে অথবা দু'হাজার বছর আগে যখন আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগার এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তখন থেকে যদি নোবেল পুরস্কার চালু হত, তাহলে মিশর বা আরব দেশগুলি থেকে ক'জন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাবার যোগ্য বিবেচিত হতেন। বলাই বাহুল্য সেই তালিকাটি দীর্ঘ এবং তাতে অনেক নামই আছে, যাঁদের কথা আমরা বিশেষ জানি না।

এখানে একথাও মনে রাখা দরকার যে, শুধু মিশরীয় নয়, পরবর্তীকালে এশিয়ার এবং ভূমধ্যসাগরীয় বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে আরবি ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে সুসংহতরূপে ইউরোপের কাছে পৌঁছে দিতে আরব বিজ্ঞানীরা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। খ্রিস্টীয়

বইটি একজন বিজ্ঞানীর গড়ে ওঠার কাহিনী। তিনি এর সঙ্গে অঙ্গীভূত করেছেন তাঁর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অনুভূতি ও চিন্তাভাবনা।

সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী অবধি বাগদাদের খলিফাদের উদ্যোগে মধ্য এশিয়া থেকে স্পেন অবধি জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ওই কেন্দ্রগুলিতে বিদগ্ধ আরব বিজ্ঞানীরা মূল্যবান গবেষণা করেন, যেমন গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় আল-খোয়ারিজমি, রসায়নে আল-রাজি, চিকিৎসাবিদ্যায় আভিসেন্না, এবং পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়, যেমন আলোকতত্ত্বে আল-হায়থাম, যাঁকে এই বিষয়ে নিউটনের পূর্বসূরি ধরা হয়। বহু প্রামাণ্য পুস্তকও রচিত হয় এবং অনুবাদ গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি হল আল-ফাজারি দ্বারা অনূদিত ভারতীয় গণিতজ্ঞ ব্রহ্মগুপ্তের বিখ্যাত বই 'ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত'। এইসব চর্চিত জ্ঞান ক্রমশ লাতিনে অনুবাদের মাধ্যমে ইউরোপের দেশগুলিতে পৌঁছতে থাকে। এরই ফলস্বরূপ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে ইউরোপে আধুনিক জ্ঞানচর্চার উদ্যোগ শুরু হয়।

পরবর্তীকালে কোপারনিকাস ও গ্যালিলিওর সময় থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটে মূলত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদেরই অবদানে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চা আর তেমনভাবে দানা বাঁধতে পারেনি। নোবেল পুরস্কার চালু হবার পর এই পুরস্কার পেতে একজন মধ্যপ্রাচ্যের বিজ্ঞানীর প্রায় একশো বছর লাগল। এই আক্ষেপবোধ থেকেই অধ্যাপক জুয়েলের আত্মকথন লেখার তাগিদ, একথা আলোচ্য বইটির ভূমিকায় জানিয়ে তিনি উৎসর্গ পাতায় লিখেছেন, "To Egypt. You lit the beacon of civilization. You deserve a brilliant future. May my voyage light a candle of hope for your youth."

তিপ্পান্ন বছর বয়সে নোবেল জয়ের এই যাত্রা শুরু নীল নদের তীরে দেসুক নামে একটি ছোট শহরে। ওখানে কাটানো তাঁর কৈশোর ও যৌবনের উন্মেষের দিনগুলি, ওখানকার সামাজিক পরিমণ্ডল ও পারিবারিক প্রভাব কীভাবে তাঁর জীবনবোধের সঙ্গে সুফি সংস্কৃতির উদারমনস্ক ধ্যান-ধারণাকে নিবিড়ভাবে যুক্ত করে দেয়, এবং পাশাপাশি তাঁর মননে বিজ্ঞানও একটি বড় জায়গা করে নেয় তার আন্তরিক বিবরণের মধ্যে দিয়ে আত্মকথনটি ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। আঙ্গিকের দিক দিয়ে এই বইটির বৈশিষ্ট্য হল—এটিকে লেখক কেবল একজন বিজ্ঞানীর গড়ে ওঠার কাহিনী, তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ও সৃজনশীলতার আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি এর সঙ্গে অঙ্গীভূত করেছেন তাঁর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অনুভূতি ও চিন্তাভাবনা। তাঁর জীবনের যাত্রাপথে পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটও এই আলোচনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

বিজ্ঞানী হিসেবে আহমেদ জুয়েলের বিকশিত হবার ভিত্তি তৈরি হয়েছিল মিশরীয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই। তারপর উচ্চতর গবেষণার কাজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ওখানকার পরিমণ্ডলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস, এবং সেই সূত্রে নানাবিধ মিশ্র অভিজ্ঞতা। এরই মধ্যে তাঁর গবেষণার কাজ চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগোতে থাকে এবং পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনবোধের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এক সুন্দর-অনায়াস মিশ্রণ ঘটে—এইসব অনুভূতিপূর্ণ বর্ণনা বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে। আরও একটি আকর্ষণীয় দিক হল, বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নশীল ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির দৃষ্টিকোণ থেকে লেখকের ভাবনাচিন্তা, এবং নোবেল জয়ের পর তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মজীবন সম্পর্কে আভাস। বিজ্ঞান গবেষণা ও সামাজিক স্তরে তিনি ভবিষ্যতে ঠিক কী ধরনের কাজ করার কথা ভাবছেন, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণার একটি বড় মাপের উদ্যোগ নেওয়ার যে-চেষ্টা তিনি আরম্ভ করেছেন, আলোচ্য বইটির শেষের দিকে তা খানিকটা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

> আজ থেকে প্রায় একহাজার বছর আগে আলোকতত্ত্বে তাঁর গবেষণাকালে আল-হায়থাম আলোকরশ্মির সরলরেখায় গমন এবং আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তখন একটি অন্ধকার ঘরে জানলাকে কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে কাপড়ের মধ্যে একটি ছোট ফুটো করে, উল্টো দিকের দেওয়ালে বাইরের বস্তুর প্রতিবিম্ব তৈরি করে তিনিই প্রথম 'ক্যামেরা'-র ধারণার সূত্রপাত করেন।

আলেকজান্দ্রিয়ার মফস্বল শহর দেসুকেরই একটি সরকারি বিদ্যালয়ে আহমেদ জুয়েলের পড়াশোনা শুরু। তারপর আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠ শেষ করে প্রাথমিকভাবে গবেষণার কাজ তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই শুরু করেন। তাঁর শিক্ষকদের সঙ্গে এক সহজ সুন্দর সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে কীভাবে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নভিত্তিক পরীক্ষামূলক অনুসন্ধানের প্রতি তাঁর একটি সহজাত আকর্ষণ গড়ে ওঠে, এবং বিশেষ করে স্পেকট্রোস্কোপি সংক্রান্ত গবেষণার কাজে তিনি আগ্রহী হয়ে পড়েন—তার অন্তরঙ্গ বিবরণ এই বইটিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সময় মিশরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষামূলক গবেষণার কাজ অনেক নতুন সম্ভাবনা খুলে দেয়। আহমেদ জুয়েলের শিক্ষকরাই তাঁকে উৎসাহ দিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবার জন্য, যেখানে তিনি এই ধরনের গবেষণার সবচেয়ে ভাল সুযোগ পাবেন।

মার্কিনদেশে পাড়ি দিয়ে পেনসিলভানিয়া এবং বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে ১৯৭৬ সাল থেকে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতেই গবেষণারত এবং বর্তমানে সেখানে তিনি একটি বিরল সম্মানের অধিকারী—দু-দুবার নোবেল পুরস্কার বিজয়ী লিনাস পাউলিং নামাঙ্কিত রসায়নবিদ্যার অধ্যাপকের পদ ছাড়াও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবেও তিনি আসীন। আশির দশকের মাঝামাঝি অধ্যাপক জুয়েলের বিখ্যাত কাজ লেসার ফোটোগ্রাফির এমন একটি পদ্ধতির উদ্ভাবন (ফেমটোসেকেন্ড লেসার ব্যবহার করে ফেমটোস্কোপি), যাকে নোবেল পুরস্কার কমিটি বর্তমান সময়ের সবচেয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন 'ক্যামেরা' হিসেবে অভিহিত করেছেন। অণু-পরমাণুদের জগতে অত্যন্ত দ্রুতহারে যে-ঘটনাবলি ঘটে, বিশেষ করে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময়, তার 'স্লো মোশন' ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে এই 'ক্যামেরা'-র সাহায্যে। অল্প সময়ের মধ্যে কত দ্রুত এই 'ক্যামেরা' ছবি তুলতে পারে এখানে তার একটি আন্দাজ দেওয়ার চেষ্টা করা যাক, এবং এই সূত্রে এই আবিষ্কারের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা বলা যাক, যার নির্যাস আলোচ্য বইটিতেও দেওয়া আছে।

আমরা যখন কোনও কিছু দেখি তার প্রতিবিম্ব আমাদের চোখের রেটিনায় সাধারণত এক সেকেন্ডের প্রায় ষোলো ভাগের এক ভাগ সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এর চেয়ে কম সময়ের ব্যবধানে চলমান অবস্থায় কোনও কিছুকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করা আমাদের পক্ষে খালি চোখে সম্ভব হয় না। তাই যতটা সম্ভব অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর তোলা ছবির মাধ্যমে কোনও গতিশীল বস্তুকে বা কোনও ঘটনার খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করাটাই হল মোশন পিকচার ফোটোগ্রাফির মূল উদ্দেশ্য। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন স্থিরচিত্র ফোটোগ্রাফি বিকশিত হচ্ছে, তখন থেকেই চলমান বস্তুর ছবি তোলার ভাবনা আরম্ভ হয়। অবশেষে যে-অবদানগুলির উপর ভিত্তি করে চলমান ছবির ফোটোগ্রাফির সূত্রপাত ঘটে, তার উৎস হল দুটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান।

প্রশ্নগুলি এই রকম, একটি ছুটন্ত ঘোড়ার চারটে খুর কি কখনও একসঙ্গে শূন্যে থাকে? অন্যটি, একটি বিড়ালকে যদি মাটির কয়েক ফুট উপর থেকে মাথা নীচে রেখে সোজা ফেলে দেওয়া হয় তবে কীভাবে বিড়ালটি এক সেকেন্ডের কম সময়ের মধ্যেও তার শরীরের ভঙ্গিমা এমনভাবে ঠিক করে নেয় যে, মাটির উপর পা ফেলে অবতরণ করতে পারে? প্রথম প্রশ্নটির মীমাংসা করেন ব্রিটেনের ইডউইয়র্ড মিউব্রিজ, ১৮৭৮ সালে; অনেকগুলি ক্যামেরা ব্যবহার করে তাদের শাটার খোলাকে ঘোড়ার দৌড়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তিনি মিলিসেকেন্ড (সেকেন্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ) সময়ের ব্যবধানে পর পর ছবি তুলে প্রমাণ

করতে সক্ষম হন যে, ছুটন্ত ঘোড়ার চারটে খুর মাঝে মাঝেই একসঙ্গে শূন্যে থাকে। দ্বিতীয় প্রশ্নটির অন্বেষণ করতে গিয়ে মিউব্রিজ ব্যবহৃত পদ্ধতির উন্নতি করেন ফরাসি অধ্যাপক এতিয়েন-জ্যুল মারে। অনেকগুলি ক্যামেরার পরিবর্তে একটিমাত্র ক্যামেরা ব্যবহার করে তার শাটার খোলা থাকার সময়কে মিলিসেকেন্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে একটি ফিল্ম স্ট্রিপের উপর পর পর এক্সপোজারের মাধ্যমে গতিশীল ছবি তোলার যে-পদ্ধতি তিনি ব্যবহার করেন, সেটিকেই আধুনিককালের মোশন পিকচার ফোটোগ্রাফি-র ভিত্তি ধরা যেতে পারে। ফরাসি বিজ্ঞান পত্রিকা 'লা নাত্যুর'-এ ১৮৯৪ সালে মারের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় এবং এক বছরের মধ্যেই ফরাসি দেশে ল্যুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়ের চেষ্টায় ১৮৯৫ সালের শেষের দিকে সিনেমাটোগ্রাফের জন্ম—যার সাহায্যে চলমান ছবির প্রক্ষেপণ ও নেগেটিভ থেকে প্রিন্ট নেওয়াও সম্ভব হয়, অচিরেই যা ব্যবহার করে শিল্পের এক অনন্য মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের বিকাশ ঘটে।

অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার তাগিদে, বিশেষ করে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় যে-পরিবর্তনগুলি ঘটে, তা দেখার জন্য মিলিসেকেন্ডের চেয়েও অনেক কম সময়ের ব্যবধানে ছবি তোলার প্রয়োজনে মোশন পিকচার ফোটোগ্রাফি-র নানা বিবর্তন ঘটতে থাকে। খুব অল্প সময়ের জন্য স্থায়ী আলোর ছোট ছোট গুচ্ছ (লাইট পালস্) ব্যবহার করে একটি চলমান বস্তুকে পর পর দ্রুত আলোকিত করে ছবি তোলার যে-স্ট্রোবোস্কোপিক পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে, তার ফলে মাইক্রোসেকেন্ড, অর্থাৎ সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের ব্যবধানে কোনও গতিশীল বস্তুকে, যেমন আপেল ভেদ করে চলে যাওয়া একটি গুলিকে স্লো মোশন-এ দেখা সম্ভব হয়। স্ট্রোবোস্কোপিক পদ্ধতিতে ছবি তোলার এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত আলোকগুচ্ছের স্থায়িত্বকালকে ক্যামেরার শাটার খোলার সময়ের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যা নির্ধারণ করে কত সময়সীমা পর্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কোনও ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। ১৯৬০ সালে লেসার আবিষ্কারের আগে এই সময়সীমা মাইক্রোসেকেন্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অল্পস্থায়ী পালস্-এর ব্যবহার এই সময়সীমাকে মাইক্রোসেকেন্ডের নীচে নামিয়ে আনার সম্ভাবনা খুলে দেয়।

কিন্তু অণু-পরমাণুদের জগতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় যা কিছু ঘটে, তার খুঁটিনাটি দেখার জন্য মাইক্রোসেকেন্ডের চেয়েও যথেষ্ট কম সময়ের ব্যবধানে পর পর ছবি তোলা প্রয়োজন। রাসায়নিক বিক্রিয়াকালীন যখন আণবিক গঠনের পরিবর্তন হয়, তখন সাধারণত পরমাণুদের বিচরণ এক কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড বেগে কয়েক অ্যাংস্ট্রম (এক অ্যাংস্ট্রম এক সেন্টিমিটারের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ) দূরত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই তথ্য থেকে হিসেব করলে দেখা যায় যে, রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় অণুদের এবং পরমাণুদের বিচরণ সূক্ষ্মভাবে, অর্থাৎ স্লো মোশনে দেখতে গেলে যে-সময়সীমার ব্যবধানে পর পর ছবি তোলা প্রয়োজন, তা হল এক থেকে দশ ফেমটোসেকেন্ড (এক ফেমটোসেকেন্ড হল এক মাইক্রোসেকেন্ডেরও একশো কোটি ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ এক সেকেন্ডের কোটি ভাগের কোটি ভাগের থেকেও ছোট সময়)। এছাড়াও মনে রাখা দরকার যে, রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলির সমগ্র স্থায়িত্বকাল সাধারণত ১০০-২০০ ফেমটোসেকেন্ড। এই অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে ফেমটোসেকেন্ড ব্যবধানে অত দ্রুত পর পর ছবি তুলে কোনও রাসায়নিক বিক্রিয়াকে স্লো মোশনে পর্যবেক্ষণ করতে পারা যে কী কঠিন বৈজ্ঞানিক চ্যালেঞ্জ, তা সহজেই অনুমেয়; এ কাজ আদৌ কীভাবে সম্ভব হবে, এই বিষয়ে বহু বিজ্ঞানীই সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু ১৯৮৬ সাল নাগাদ আহমেদ জুয়েল ফেমটোসেকেন্ড পালস লেসার ব্যবহার করে এমন এক অভিনব পদ্ধতি (ফেমটোস্কোপি) উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন, যার সাহায্যে দশ ফেমটোসেকেন্ড পর পর ছবি তুলে রাসায়নিক বিক্রিয়া চলাকালীন অণুদের রূপান্তর ঘটার সময় পরমাণুদের মধ্যে রাসায়নিক বন্ধনের কীভাবে পরিবর্তন ঘটে, কীভাবে নতুন বন্ধন গড়ে ওঠে বা পুরনো বন্ধন ভেঙে যায় তার খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়। এবং এর ফলে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অনেক তাত্ত্বিক গূঢ় রহস্যের পরীক্ষামূলক গবেষণায় এক নতুন ধারার সূচনা ঘটে।

ফেমটোস্কোপির কার্যকারিতা প্রথম প্রমাণ করা হয় রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় যথাক্রমে আয়োডোসায়ানাইড (ICN) এবং সোডিয়াম আয়োডাইড (NaI) অণুদের ভিতর পরমাণুদের ঠিক কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে তার স্লো মোশন ছবি তোলার মাধ্যমে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় (রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা থেকে আরম্ভ করে জীববিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যায়) রাসায়নিক বিক্রিয়ার মৌলিক গুরুত্ব বলার অপেক্ষা রাখে না, তাই বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়াকে নিবিড়ভাবে বোঝা ও নিয়ন্ত্রণ করার তাগিদে আবিষ্কারের কয়েক বছরের মধ্যেই ফেমটোস্কোপি বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে মোশন পিকচার ফোটোগ্রাফি ব্যবহারের প্রচুর নতুন সম্ভাবনা খুলে দেয়। এই পুরো সৃজনশীল প্রক্রিয়ার যে-অন্তরঙ্গ বিবরণ এই বইটিতে লেখক এক আবিষ্কারকের দৃষ্টিকোণ থেকে দিয়েছেন, তা সচরাচর পাওয়া যায় না। কী কী মৌলিক ধারণার উপর ভিত্তি করে এবং পরীক্ষাগত কৌশলের সঙ্গে তত্ত্বগত চিন্তাভাবনার ঠিক কী ধরনের মেলবন্ধনের মধ্যে দিয়ে এই আবিষ্কার সম্ভব হয়, তাকে এক অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনীর মেজাজে লেখক যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তা বিজ্ঞান-অনুরাগী যে-কোনও পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় ও অনুপ্রেরণামূলক হবে।

প্রখ্যাত পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যান একবার বলেছিলেন যে, যদি একটিমাত্র বাক্যের সাহায্যে বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণাকে প্রকাশ করতে হয়, তবে সেই বাক্যটি হবে, সব বস্তুই পরমাণু দিয়ে তৈরি। লিউসিপাস, ডেমোক্রিটাস প্রমুখ গ্রিক দার্শনিকদের সময় থেকে গত প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে পরমাণু সম্পর্কে ধারণার নানা বিবর্তন ঘটেছে, যার ফলে অণু-পরমাণুদের জগতের ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করার জন্য নিউটনীয় মেকানিক্সের পরিবর্তে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের উদ্ভব ঘটে গত শতাব্দীর শুরুর দিকে। কিন্তু গত সাতের দশক পর্যন্ত পরমাণুদের কোনও ছবি তোলা সম্ভব হয়নি!

স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপি পদ্ধতি ব্যবহার করে পরমাণুদের স্থিরচিত্র তুলতে প্রথম সফল হন জার্ড বিনিং এবং হাইনরিখ রোরার, যাঁদের ১৯৮৬ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়; পরবর্তী কঠিন পদক্ষেপটি কাকতালীয়ভাবে ওই বছরই ঘটে, যখন জুয়েল তাঁর উদ্ভাবিত ফেমটোস্কোপ ব্যবহার করে গতিশীল পরমাণুদের ছবি তুলতে সমর্থ হন। পরে ১৯৯৯ সালে যখন জুয়েলকে রসায়নবিদ্যায় এককভাবে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তখন তাঁর এই অবদানের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে নোবেল কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয় : "Zewail's use of the fast laser technique can be likened to Galileo's use of his telescope...We can now see the movements of individual atoms as we imagine them. With the world's fastest camera available, only the imagination sets bounds for new problems to tackle."

ফেমটোস্কোপকে আধুনিকতম 'ক্যামেরা' হিসেবে নোবেল কমিটির উল্লেখ প্রসঙ্গে লেখক এই আত্মজীবনীতে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন আরব বিজ্ঞানী আল-হায়থামকে (পাশ্চাত্যে যিনি আলহাজেন নামে পরিচিত)। আজ থেকে প্রায় একহাজার বছর আগে আলোকতত্ত্বে তাঁর গবেষণাকালে আল-হায়থাম আলোকরশ্মির

> প্রায় ছ'হাজার বছর আগে যখন মিশরীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটছে অথবা দু'হাজার বছর আগে যখন আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগার এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তখন থেকে যদি নোবেল পুরস্কার চালু হত তাহলে মিশর বা আরব দেশগুলি থেকে ক'জন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাবার যোগ্য বিবেচিত হতেন? বলাই বাহুল্য সেই তালিকাটি দীর্ঘ এবং তাতে অনেক নামই আছে, যাঁদের কথা আমরা বিশেষ জানি না।

কলকাতা বইমেলায় স্টল নং. ৩৫০
দিলীপ বসু — পরমাণু বোমার নেপথ্য ইতিহাস ৯০
বেলাবাসিনী গুহ ও অহনা গুহ — ঋগ্বেদ ও নক্ষত্র ১২০
শংকর চক্রবর্তী — মহাবিশ্বে আমরা কি নিঃসঙ্গ ৭৫
অরূপরতন ভট্টাচার্য — নক্ষত্রলোক ও নক্ষত্র পরিচয় ৯০
শংকর সেনগুপ্ত — পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ৫০, আইনস্টাইনের বিশ্ব (অনু) ৭৫, বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যা ও ব্যক্তিত্ব ১২০
শৈলেশ দাশগুপ্ত — হিন্দু গণিত ও ভাস্করাচার্য ৭৫
রমাতোষ সরকার — প্রাচীন ভারতের গণিত চিন্তা ৫০
অমল কে. ভৌমিক — লোকগণিত ঃ সরূপ ও বৈশিষ্ট ১২০
ড. সুবীর নাগ — AIDS কাউন্সেলিং ও বয়ঃসন্ধির জীবনশৈলী শিক্ষা ৯০, গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং ৬০
স্বপন কুমার দাস — বাংলার অরন্য ও আরণ্যক ১০০, মাছের শত্রু রোগ ও প্রতিকার ৭৫, চেনা জীব অচেনা জগৎ ৩০
কমল বিকাশ বন্দোপাধ্যায় —অঙ্ক নিয়ে মজার খেলা ৫০, রহস্যে ঘেরা মহাবিশ্ব ৩০, জীব জগতের গল্প ২৫
শ্যামদুলাল কুণ্ডু — শব্দের পেখম ৫০
দেবব্রত চন্দ্র —বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ইতিকথা ৩০
সমীর কুমার ঘোষ — কেন এমন হয় ৩০
শ্যামল চক্রবর্তী — জীন জীবন ক্লোরিণ ৫০
বেস্টবুকস ১এ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯ ☎ ২২৫৭ ১০৯৬

From the Pen of a Growing Child

Scribbles & Strokes
- A 4 to 14's World
Sohini Basak
Poems & Stories with lively illustrations
Wired witches to Adventurous pixies, Outlandish aliens to Legendary birds – the variety of moods and themes are sure to fascinate young minds.
Distributor
Dey's Publishing 13 Bankim Chatterjee St. Kol-73 ☎2219-7920

পৃথ্বীশ সানা-র

বিতর্কিত, চাঞ্চল্যকর তথ্যে ভরা প্রবন্ধ সংকলন
কৃষি জমিতে শিল্প ঃ সময়ের ভাবনা ৮০ টাকা
লেখকের ছোটগল্প সংকলন
অন্ধকার ভারতবর্ষ ৪০ টাকা
সুনীলের 'নীরা', বিনয়ের 'গায়ত্রী' আর এক নারীর প্রেমগাথা
বিবেক চৌধুরী-র
অথচ কেন স্বয়ংপ্রিয়া
শেষ সন্ধ্যায় কাছে ডাকেনি ৩০ (২য় সং)
(কাব্যোপন্যাস)
জগন্নাথ প্রামাণিক-এর
শিলাবতীর তীরে তীরে (উপন্যাস) ৩০ (২য় সং)
তারকনাথ বুক সিন্ডিকেট ৬০বি, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩ স্টল নং ৫৫৫

সরলরেখায় গমন এবং আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তখন একটি অন্ধকার ঘরে জানলাকে কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে কাপড়ের মধ্যে একটি ছোট ফুটো করে, উল্টো দিকের দেওয়ালে বাইরের বস্তুর প্রতিবিম্ব তৈরি করে তিনিই প্রথম 'ক্যামেরা'-র ধারণার সূত্রপাত করেন। এইসব গবেষণা আল-হায়থাম যে-প্রামাণ্য বইয়ে আরবি ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন, তা প্রায় পাঁচশো বছর পরে অর্থাৎ নিউটনের জন্মের প্রায় একশো বছর আগে, ষোড়শ শতাব্দীতে অপ্টিকি থেসারস নামে লাতিন ভাষায় ইউরোপে অনূদিত হয়। 'ক্যামেরা'-র সেই প্রথম ধারণা হাজার বছর ধরে নানাভাবে বিবর্তিত হয়ে অবশেষে বিংশ শতাব্দীর শেষে আর এক মধ্যপ্রাচ্যের বিজ্ঞানী জুয়েলের গবেষণাকর্মের মধ্যে দিয়ে এক চমকপ্রদ পরিণতি লাভ করে—এই রোমাঞ্চকর অনুভূতিবোধ ব্যক্তিগতভাবে জুয়েলকে যে কীভাবে আবিষ্ট করে, তা এই আবিষ্কারের কাহিনির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ছড়িয়ে আছে।

> প্রাচীন সভ্যতাগুলির গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে আরবি ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে ইউরোপের কাছে পৌঁছে দিতে আরব বিজ্ঞানীরা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

আলোচ্য আত্মজীবনীর দশটি পরিচ্ছেদের মধ্যে মোটামুটিভাবে তিনটি পরিচ্ছেদ জুড়ে আছে লেখকের গবেষণাজীবন সংক্রান্ত বিজ্ঞানভিত্তিক প্রাঞ্জল আলোচনা—এর মধ্যে তত্ত্বগত ও গাণিতিক জটিলতা নেই, তাই অনেকের পক্ষেই বোধগম্য হতে পারে। বাকি পরিচ্ছেদগুলির বিষয়বস্তুর আবেদন আরও সার্বিক, যার আভাস এই গ্রন্থ আলোচনার গোড়ার দিকে দেওয়া হয়েছে। এখানে বেশি বিস্তারিত আলোচনায় যাবার সুযোগ নেই, তাই সংক্ষেপে কেবল কয়েকটি কথার উল্লেখ করছি।

মিশর এবং ইজরায়েলের মধ্যে ১৯৭৩ সালে যুদ্ধের দু'বছর বাদে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘোরতর তেল-সংকট, সেই সময় প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চাকরির ইন্টারভিউয়ের সময় আহমেদ জুয়েলকে প্রশ্ন করা হয় যে, কেন তিনি তাঁর নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছেন না যদিও মিশরে যথেষ্ট তেল পাওয়া যায়। এই ঘটনাটি উল্লেখ করে লেখক এই আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, তাঁর দেশে ফিরে না যাওয়ার মূল কারণ মিশরে তাঁর পরীক্ষামূলক গবেষণার উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাব, এর সঙ্গে মিশরে তেল সম্পদের কী সম্পর্ক আছে তা তাঁর কাছে বোধগম্য হয়নি, প্রশ্নকারকও তা তাঁকে ব্যাখ্যা করতে পারেননি, এবং যে কোনও কারণেই হোক তখন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কোনও সুযোগ পাননি। যদিও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর এরকম অভিজ্ঞতা আর কখনও হয়নি, তবুও বর্তমান বিশ্বে যে-ধরনের জটিল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক টানাপড়েন চলছে, বিশেষ করে ৯/১১-পরবর্তী ঘটনাবলি এবং তথাকথিত 'সভ্যতার সংঘাত' ('ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশনস') নিয়ে যে-ধরনের আলোচনা পাশ্চাত্যে শুরু হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর কিছু চিন্তাভাবনা ব্যক্ত করা তাঁর কাছে জরুরি মনে হয়েছে। আত্মজীবনীটিতে অন্তর্ভুক্ত এই বিষয়ে একটি সংবেদনশীল আলোচনা, এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির সমস্যাবলির অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত দিক নিয়ে একটি পরিচ্ছেদ, যার শিরোনাম 'এ পার্সোনাল ভিশন: দ্য ওয়ার্ল্ড অফ দ্য হ্যাভ নটস' বইটিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

ঐতিহ্যগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় ও আদর্শগত মৌলবাদের বিরুদ্ধে কীভাবে সক্রিয় হওয়া যায়, এই বিষয়েও লেখক অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। এই সূত্রে তিনি সযত্নে বর্ণনা করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কীভাবে ইসলামি অধ্যাত্মবাদ ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবোধের সমন্বয় ঘটেছে, ছোটবেলায় তিনি কীভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, যখন তাঁকে কোরান থেকে শেখানো হয় যে, মহম্মদের কাছে প্রথম যে-দৈববাণীটি প্রতিভাত হয় তা হল 'Iqra!' ('Read!')।

কয়েক বছর আগে অধ্যাপক জুয়েল যখন ভারতে আসেন তখন দিল্লিতে এক আলাপচারিতায় বলেছিলেন যে, তাঁর জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির 'ভিশন অফ দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড', যার মধ্যে এই উদ্ধৃতিটি 'to know how to see' তাঁর গবেষণাজীবনের বীজমন্ত্র। তিনি এও বলেছিলেন যে, তাঁর কাছে অনুপ্রেরণার আর এক বড় উৎস হল সুফি সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী উম কুলথুমের গান। ১৩ বছর বয়স থেকে তিনি কীভাবে আরবি ধ্রুপদি সঙ্গীত এবং উম কুলথুমের গানের ভক্ত হয়ে পড়েন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই অনুরাগ কীভাবে ঘনীভূত হয়, এবং 'আরবি সঙ্গীতের পিরামিড' বলে অভিহিত এই গায়িকার মৃত্যুর পর তিনি কীভাবে শোকগ্রস্ত হয়েছিলেন, এসব কথাও এই আত্মজীবনীতে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে।

আবেগ, মনন ও কল্পনার সমন্বয়ে স্ফুরিত সৃজনশীলতার অনুশীলনে বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির অন্যান্য ধারার মধ্যে যে এক আশ্চর্য মিল রয়েছে, এই বইটিতে তারই অনুরণন।

ভয়েজ থ্রু টাইম: ওয়ক্স্ অফ লাইফ টু দ্য নোবেল প্রাইজ্। আহমেদ জুয়েল
সেন্টার ফর ফিলজফি অ্যান্ড ফাউন্ডেশনস অফ সায়েন্স, দিল্লি, সৃষ্টি পাবলিশার্স এবং ডিস্ট্রিবিউটরস